ছোটগল্পের ধারায় জগদীশ গুপ্তের অবদান আলোচনা করো?

কল্লোল উত্তর কালের বাংলা গল্পসাহিত্যে জগতে জগদীশ গুপ্ত জগৎ ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে তীব্র ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে প্রচলিত মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এছাড়াও জীবন সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক তির্যক দৃষ্টি, গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি যে কথাশিল্পীর আধুনিক দৃষ্টি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। জীবনের আঁধার চোরা পথে, মনগহনের পিচ্ছিল সর্পিল পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা। এদিক থেকে জগদীশ গুপ্ত বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য। জগদীশ গুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের তুলনামূলক আলোচনা করে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন,

"এই তিন গল্প লেখকই প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা, রহস্যময়তা, স্ববিরোধিতা তাকে জানতে চেয়েছিলেন। গল্পকার হিসেবে তাঁরা চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতশূন্য, আবেগ বিষয়ে নির্বিকার, শিল্পী হিসেবে নিরাসক্ত পরিবেশ সচেতন, বিজ্ঞানবুদ্ধি-সচেতন .."

কথাসাহিত্যে জগদীশ গুপ্ত রিয়ালিজমের শিল্পী নন, ন্যাচারালিজমের শিল্পী। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা নয়—'বিনোদিনী' (১৩৩৪), 'রূপের বাহিরে' (১৩৩৬), 'শ্রীমতী' (১৩৩৭), 'উদয়লেখা' (১৩৩৯), 'উপায়ন' (১৩৪১), 'পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক' (১৩৪১), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৩৪২), 'তৃষিত সৃক্কনী' (১৩৪৯), 'মেঘাবৃত অশনি' (১৩৫৪)। তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয় ১৩৩১-এ 'বিজলী' পত্রিকায় পরে 'কালিকলম' পত্রিকায় ১৩৩৩ থেকে। জগদীশ গুপ্ত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে প্রায় অর্ধশত গল্প লিখলেও গল্পকার হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল না। তাঁর গল্পে মানুষের যে অসহায়তা ও পরাজয়ের বেদনা চিত্রিত হয়েছে, যে কঠিন ও নির্মম জীবনদৃষ্টি রূপায়িত হয়েছে, যে অমোঘ নিয়তির জয় ঘোষিত হয়েছে তা সাধারণ পাঠককে তাঁর প্রতি বিমুখ করে তুলেছে। কারণ সাধারণ মানুষ এই জীবনদৃষ্টির বহির্ভূত, তবে প্রাকৃতবাদী শিল্পীরূপে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরিরূপে বাংলা ছোটগল্পে জগদীশ গুপ্তের স্থান চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

তাঁর গল্পে যে মানবিক সম্পর্ক আছে তা স্বার্থচালিত। তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ স্বভাবতই নির্মম ও যৌনপ্রবৃত্তি চালিত। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তু আলোচনা করলেই এই সত্য পরিস্ফুট হবে। জগদীশ গুপ্তের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির পরিচয় নিলে তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয় স্পষ্ট হবে। যেমন-

'পামর'—বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত পিতা যখন জোর করে অপদার্থ, অকর্মা পুত্রকে চাকরির খোঁজে পাঠালেন তখন ছেলে অনায়াসে পিতার পুরানো কর্মস্থলে গিয়ে পিতৃদায় বলে সংগৃহীত টাকা, চাকরির প্রথম মাসের মাইনে বলে বাপের কাছে মানি অর্ডার করে পাঠায়।

'লোকনাথের তামসিকতা'—বাপ ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী মনোনীত করে পরে বাতিল করে দেন। এই ঈর্ষায় যে, তাঁর নিজের বউ তো সুন্দরী নয়—সুতরাং ছেলের বউ-ই বা কেন সুন্দরী হবে।

'পৃষ্ঠে শরলেখা'—বাপ ছেলের জন্য নির্বাচিতা পাত্রী দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেই বিয়ে করে আনে এবং ছেলেকে ভর্ৎসনা করেন এই কারণে যে, তার স্ত্রীকে ছেলে মা বলে ডাকে না।

'ঊর্মিলার মন'—দুই প্রাণের সখীর একজন যখন বিধবা হয় তখন সে নিজের অদৃষ্টকে মেনে নেয়। কিন্তু যে মুহূর্তে শোনে অন্য বান্ধবীর ছেলে মারা গেছে তখন সহানুভূতির ছলে নিপুণভাবে গোখরো সাপের চেয়ে তীব্র বিদ্বেষের বিষ ঢালে।

'পয়োমুখম্'—কবিরাজ শ্বশুর ছেলের বারবার বিয়ে দিয়ে পণলাভের আশায় একটির পর একটি পুত্রবধূকে হত্যা করে যায়। তবে শেষ পর্যন্ত ভূতনাথের কাছে পিতা কৃষ্ণকান্ত ধরা পড়ে যায় এবং ভূতনাথ বলে, "ঐ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মরল না, বাবা। পারেন ত নিজেই খেয়ে ফেলুন। বলিয়া সে ঔষধ সমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিল।" স্নেহের ছলে পিতা কৃষ্ণকান্ত এ গল্পে গোপন আততায়ীর ভূমিকা নিয়েছে। পিতৃভক্ত ভূতনাথ শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে পিতার শ্রাদ্ধের আয়োজক। গল্পের ভাষারীতি শিল্পসম্মত।

জগদীশ গুপ্ত কোন রূপকের মাধ্যমে বা ব্যঙ্গের দ্বারা নয়,সরাসরি এই ধরনের আপাত মাধুর্যের আড়ালে মানুষের বিষময় স্বরূপকে এঁকেছেন। এজন্য 'পয়োমুখম্' গল্পটি তাঁর শিল্পীস্বভাবের প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প।
'আমি ও দেবরাজের স্ত্রী'— গরীব অশিক্ষিত বন্ধুর সুন্দরী বউ হবে শুনে বড়লোক বন্ধু রেগে আগুন—পরে যখন দেখে সুন্দরী নয়, তখন আশ্বস্ত হয়।
'পুরাতন ভৃত্য'—বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য অনায়াসে রাস্তায় ভয় দেখিয়ে মনিবের টাকা নিয়ে পালায়।

জীবন সম্বন্ধে এক দুঃসাহসী ভাবনার পরিচয় রয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। আসলে জগদীশ গুপ্তের শিল্পী ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ছিল এক কাঠিন্য ও সংহতি। তিনি গল্প লেখার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতেন। সেই পরিকল্পনাকে ধ্রুব সত্য বলে মনে করে তিনি গল্পের মধ্যে কাঠিন্য ও অনিবার্যতাকে গেঁথে দিতে পারতেন। আর কার্য-কারণ বিন্যাসের অসম্ভবও সম্ভব হয়ে উঠত; কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হত না। তবে গল্পরসের মধ্যে ছিল সমকালীন।লেখকদের থেকে আপেক্ষিক রুক্ষতা, যার জন্য পাঠকের কাছে তা সবসময় আকর্ষণীয় ছিল না।

অমোঘ, ভয়ংকর, আর জীবনের সব প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত। তাঁর গল্পের আলোচনা থেকে তাঁর মানসিকতার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রেমের স্নিগ্ধ মধুর রূপ অনুপস্থিত। তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রী গ্রামের নীচুতলার মানুষ, নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরীব। শরৎচন্দ্রের বা বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসের নীচুতলার মানুষের সঙ্গে তাদের মিল নেই। তিনি দেখিয়েছেন দেহাশ্রিত যৌনচেতনার রূপ। যৌবনের রোমান্টিক স্বপ্ন বা বিহ্বল ভাববিলাসে তাঁর আস্থা নেই। শরৎচন্দ্রীয় আবেগ ও কল্লোলীয় ভাবালুতা—এই দুই রোমান্টিক উচ্ছ্বাসকে তিনি পরিহার করেছেন। তাই সবদিক থেকে আধুনিক কথাসাহিত্যিক হিসাবে জগদীশ গুপ্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।